দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

এ জি স্টক ॥শেষাংশ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ১৯৪৭—১৯৫১

রূপান্তর ঃ মোবাশ্বেরা খানম

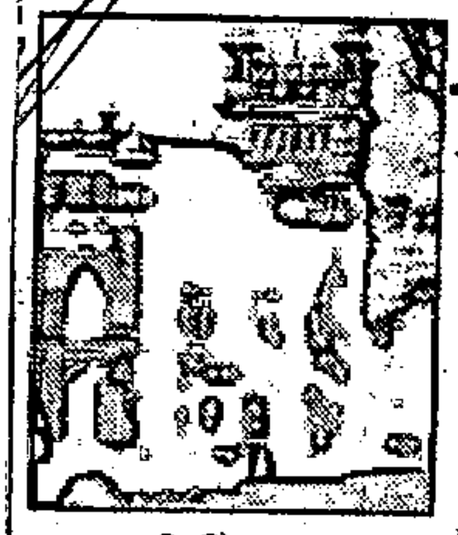

আমার বেশ ভালো একটি ডিগ্রি আছে, এবং নিজেকে সে কাজটির যোগ্য ভাবার কারণও ছিল, কিন্তু বেশ ভালোই জানতাম যে গত বিশ বছরে আমি অক্সফোর্ড ছাড়বার পর থেকে এমন কিছুই করিনি যাতে দায়িত্বশীল একটি কমিটি আমার ব্যাপারে রাজি হতে পারে। রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে যখন এমন একটি চিঠি এলো যে যদি আমাকে নিযুক্তি দেয়া হয়, তাহলে আমি কত তাড়াতাড়ি সেখানে যোগদান করতে পারি ও কেমন বেতন আশা করি, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন টাইপিস্টের ভুলে চিঠিটি এখানে চলে এসেছে। কিন্তু তার সাথেই এলো উপাচার্যের কাছ থেকে আরেকটি আনুষ্ঠানিক চিঠি যাতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা ছিল। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, আমরা অক্সফোর্ডে একই সময়ে ছিলাম এবং জানালেন যে যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোতে কিছু সময় লাগবে কিন্তু আমি যদি সত্যি সত্যিই আসতে চাই, তাহলে তার উপদেশ, আমার সুবিধের জন্যেই, আমি এখন যত শিগগিরই সম্ভব ভারতের পথের টিকিট কেটে রাখি। যদি আমি তখন জানতাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যপ্রণালীর খামখেয়ালিপনার ব্যাপারগুলো, যা পরে জেনেছি, আমি যদি ওর কথাগুলোকে এ্যাতোখানি বিশ্বাস না করতাম আমি ভুল করতাম। ডঃ মাহমুদ হাসান কমিটিতে তার মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রকৃতই আস্থাশীল ছিলেন।

আমার মনে পড়ল, অক্সফোর্ডে আমি যখন অনার্স পড়ছিলাম, উনি তখন ডক্টরেট-এর থিসিস লিখছিলেন। তাঁকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো চিনতামই না মনে হয়, তবে সেই সময়ে রোববারের সন্ধ্যা মজলিশী বিতর্কে একমাত্র আমিই ছিলাম নিয়মিত উপস্থিত ইওরোপীয়ান ছাত্রী যে কিনা ভারতীয় ব্যাপারে আগ্রহী, এমনকি মাঝে মাঝে দু'চার কথা বলবারও সাহস পেতাম, আমাদের কিছু সাধারণ বন্ধু ছিলেন এবং আমি প্রায়ই তাদের বলতাম যে আমি ভারতে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী, তবে সেদেশ স্বাধীন হবার আগে নয়। তাকে আমার উদ্দেশ্য ও প্রশংসাপত্র সম্পর্কে আবার আশ্বস্ত করাই যথেষ্ট ছিল।

এগুলোই কেন শক্তিশালী সুপারিশ হয়ে তখন কাজ করেছিল বুঝতে হলে ভেতরের অনেক কিছু জানা দরকার যা আমি নিশ্চিতই জানতাম যে ভারত দুটো পৃথক রাষ্ট্রে স্বাধীন হতে যাচ্ছে এবং ঢাকা পড়বে পাকিস্তানের ভিতরে। আমি কলকাতা ও নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা, সেখানে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের বিজয়ের কথা পড়েছি। আমি জানতাম না যে পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু এবং তারা এতো দ্রুত সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমস্যা সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। একথাও আমার মাথায় আসেনি যে যখন বৃটিশ সব অধিবাসীরাই প্রায় দেশে ফিরে আসছেন, যারা অন্যদিকে যাচ্ছেন, খুব সহজেই তাদেরকে ভুলপথের অভিযাত্রী বলা যায়। আর আমার বুদ্ধিও এমন যথেষ্ট ছিলনা যে, আমি ধারণা করতে পারি, যা বেশ পরে জানতে পাছিলাম যে, আমার অপ্রত্যাশিত আবেদনপত্রটি তাদের কাছে ঐশ্বরিক একটি অজুহাতের মতই এসেছিলো, যে কারণে তারা আরেকজন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন যার নিখুঁত যোগ্যতা ও মুসলিম গোঁড়ামিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তার সাহসের খ্যাতি। আমি যা দেখতে পেয়েছিলাম তা হচ্ছে এই যে একটি – সুযোগ আমাকে আমার প্রার্থিত গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কলেজে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম আর এস এস ফ্রাঙ্কোনিয়া জাহাজে অগ্রিম সীট ভাড়া করলাম। জাহাজটি জুলাইয়ের শুরুতে লিভারপুল থেকে ছাড়বে। বেতনের ব্যাপারে রেজিস্ট্রেশনের প্রশ্নের জবাবে আমি জানলাম, যদিও কত চাওয়া যায় সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিলনা, আমি আমার সহকর্মীদের মতই জীবনযাত্রার মান রক্ষা করে চলতে চাই এবং আশা করি একই যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ভরতীয়কে যে বেতন দেয়া হয় আমাকেও তাই দেয়া হবে। পরে জেনেছিলাম আমার উত্তরটি খুব ভালো প্রভাবরেখেছিল।

ঢাকা যে পাকিস্তানের ভেতরে পড়বে তাতে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা। আমার ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম সব বন্ধুরাই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে ইংল্যান্ডে যার ফলে সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের হিংস্রতা তারা দেখেনি। তারা স্বাধীনতাকে দেখেছে পুরো উপ-মহাদেশের আকাঙ্খার পরিপূর্ণতার হিসেবে। দেশ বিভাগকে দেখেছে এরই দুঃখজনক পরিণতি হিসেবে যা চিরস্থায়ী হতেও পারে, না-ও পারে।

অতিথি বক্তারা, মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস যে দলেরই হোক, এই ধারণাকেই নিশ্চিত করতেন। আমি অধ্যবসায়ের সাথে সেইসব বক্তৃতা শুনতাম। কংগ্রেসী বক্তারা কখনো বৃটিশ শ্রোতাদের সামনে সাম্প্রদায়িক বিবাদকে প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলিম বক্তারাও দিতেন না। যত প্রবল আবেগের সাথেই তারা "দুইজাতি" তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেখাতেন না কেন তারা এটা বোঝাতে ব্যর্থ হতেন যে, বৃটিশ রাজের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়া তাদের কাছে ততটাই যতটা হিন্দু ভারতবর্ষ।

আমি কিন্তু প্রধানত আত্মজীবনীর কোন অধ্যায় লেখার চেষ্টা করছি না, বরং পূর্ব পাকিস্তানকে দেখার প্রথম চার বছরে এর জীবন সম্পর্কে যে ধারণা আমার হয়েছে সে ধারণাই আমি লিপিবদ্ধ করছি। বাস্তব ও সত্য হতে হলে একে ব্যক্তিগত ও পক্ষাপাতপূর্ণ হতেই হবে। একটি দেহ যখন এমন বিশাল বড় ও জটিল হয় সে তাকে পূর্ণ অবয়বে দেখতে হয়, তখন এর ভেতরে যে আকৃতিই আবিষ্কার করা হোক না কেন তা হবে সেই দর্শকটির দৃষ্টি থেকে, যা তাকে দেখে, সে যা দেখে অথবা দেখেনা তা থেকে। আমার নিজের এই ছোট্ট বিবরণটি এজন্যেই দিলাম যে পাঠকেরা এখন এই দর্শকটির দৃষ্টিকে বুঝতে পারবেন, এর দৃষ্টিভঙ্গীর তারা অংশীদার হবেন বা এর বিক্রমকে তারা মেনে নেবেন কিনা ভাবতে পারবেন।

পরবর্তী ঘটনাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক নয় বলে সংক্ষেপে বিবিরণটি দিচ্ছি: "ফ্র্যাঙ্কোনিয়া" জাহাজে রওনা হয়ে গেলেন তিনি ভারতের পথে। জাহাজের অর্ধেক যাত্রীই ছিলেন ইওরোপীয়। জাহাজটিতে শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় মিসস্টক ভারতীয় গ্রীষ্মের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এডেন বন্দর হয়ে জাহাজ এসে পৌছলো বম্বেতে। বম্বে থেকে তিনদিন ট্রেনে করে এসে থামলেন কলকাতায়। সেই তার ভারত দর্শনের শুরু। শিশুর কৌতুহল নিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখেছিলেন ভারতবর্ষকে। তারপর আবার ট্রেন ও ষ্টীমার যাত্রা। ষ্টীমার থেকে বিস্মিত হয়ে কচুরিপানা ফুল দেখার সময়ে পরিচিত হয়েছিলেন বাঙালী ব্রাহ্ম সমাজের একটি মেয়ের সাথে যে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শান্তিনিকেতন, ব্রাহ্ম সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু ধারণা তার ছিল। নারায়ণগঞ্জে নেমে প্রথম তার পরিচয় ঘটল ঢাকার সাথে।

যেই আমরা ঢাকার বন্দর নারায়ণগঞ্জে পৌছলাম অমনি বাদামী রঙের কাপড় কোমরে গুজে পড়া একদল ছেলে লাফিয়ে পানিতে নেমে সাতরে স্টিমারে উঠলো। আমি এমন সাঁতার কখনো দেখিনি। কাপড় ব্যবসায়ীর কাঁচি যেমন কাপড়ের নিচ দিয়ে দ্রুতবেগে যায় তেমনি তাড়াও পানির ভেতর দিয়ে সাঁতরে নিমেষে পাটাতনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেজা চকচকে গায়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে ঘিরে ধরলো আমাদের বাক্সপেটরা গুলোকে। আমি তো ভয়ে এই ভেবেই আমার টাইপরাইটারটি আকড়ে ধরলাম যে আমাদেরও বুঝি এভাবেই তীরে উঠতে হবে। কিন্তু যথাসময়ে আমাদের নামার উপযোগী কাঠের সিঁড়ি ফেলা হল আর দেখতে আরো ধোপদুরস্ত একদল এল যাদের গায়ে ইউনিফর্মের মতো ছিল। তারা কোম্পানীর কুলি। ঐ ছেলেগুলো ছিল বাইরের, নিজের মত কাজ করার আশায় এসেছে। যেহেতু মালপত্রও প্রচুর ছিল, অসুবিধে হয়নি। আমি আমার নিজের জিনিসপত্র শুদ্ধুই ঢাকার ট্রেনে উঠতে পেরেছিলাম। আমার ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুদের খুঁজে পাইনি আর। তারা কিন্তু আমাকে খুব বুদ্ধিমানের মতই ডাকবাংলোয় একটা ঘর খুঁজে নেয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। অন্তত যতক্ষণ না আমি আমার পরবর্তী করণীয়টি জানতে পারি। বৃটিশ রাজের বেশ একটি প্রয়োজনীয় সৃষ্টি এই ডাকবাংলো। এগুলো হচ্ছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবসর কেন্দ্র; যেগুলো সরকারী কাজে প্রধানত অফিসারদের সুবিধার জন্য ব্যবহার হয়। সরকারী কর্মকর্তারাই এর প্রাথমিক দাবিদার। তবে তাদের যখন প্রয়োজন হয় না সে সময়ে সাধারণ পর্যটক বা যাত্রীরাও এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আমি উপদেশটি ঠিকই শুনেছিলাম, কিন্তু সময়টা ছিল ভুল। বাংলোগুলো তখন নবাগত কর্মকর্তায় উপচে পড়েছে। তাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জন্মের জন্যে প্রহর গুনছেন। (এবং প্রকৃতপক্ষে চার বছর পর আমি যখন সে দেশ ত্যাগ করি তখনও তারা সেখানেই)। সুতরাং আমি উপাচার্যের বাসায় ফোন করলাম। তক্ষুণি আমাকে সেখানে যেতে বলা হল। রাস্তার পাশে অপেক্ষারত একটি সাইকেল রিক্সায় মালপত্র চাপিয়ে আবার যাত্রার শেষ পর্যায় শুরু করলাম।

পুরানো ঢাকা শহর তখন নতুন রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। প্রচুর চিৎকার করে ককে ও বেল বাজিয়ে বাজিয়ে রিক্সাওয়ালা পা চালাতে লাগল। সরু গলির ভেতর দিয়ে পথচারীর ভীড়ের ভিতর দিয়ে সে চলতে লাগল। সারা পথ জুড়ে ছুটোছুটি, কেউ কাউকে খুঁজছে; কেউ কোথাও যাচ্ছে। কেউ দাঁড়াচ্ছে, কারো নিজের ছাড়া অন্যের জন্য ব্যয় করার মত মুহূর্তটিও নেই।

পথের দু'পাশে বাড়ির শূণ্য দেয়াল ভেসে উঠল, ছোট্ট ছোট্ট জানালা, যার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকা জীবনের আভাস দিয়ে যায়। এ্যাতোক্ষণে আমিও নিজের ভাবনায় ডুবে গেছি অন্যদের মত। দিনটি ছিল গরম আর ভেজা। অনেক দূরে যাত্রা শেষ করেছি, ক্ষুধার্ত, এলামেলো, আমি তখন ঘামছি। উপাচার্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে গোসল সেরে একটু পরিপাটি হওয়া দরকার। কিন্তু আমরা তখন শহরের বাইরে। বড় বড় তোরণের ভেতর দিয়ে গাছ পালায় ঘেরা বড় একটি গুরুগম্ভির প্রসাদোপম বাড়ির সামনে এলাম। ভাবলেশহীন একটি ভৃত্যের দেখা পেলাম দরজায়, সে আমায় নিয়ে গেল ঠান্ডা, সতেজ করে তোলা একটি ঘরে। ঘরটির ঠিক সামনেই সরু গলিটিতে উপচার্যের আট বছরের ছেলেটি ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ণ কোন অভিযানে ব্যস্ত। অদ্ভুত এই অনুপ্রবেশকারিটিকে সে আগে জরিপ করে নিল। তার কাঠের তলোয়ারটিকে নাটকীয় কায়দায় ঘোরালো, শেষে চমৎকার ইংরেজিতে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিল, "In my soul I am afraid of nothing"